গণেশ পাইন
আপন পুরাণ

সংকলন ও সম্পাদনা
মধুময় পাল

পুনশ্চ

সূচি

তাঁর কথা, তাঁর ছবির কথা

বাইরেটা বাংলার মাটির মতো	শ্যামল দত্তরায়	১৭
তাঁর ছবিতে লিটারারি কনটেন্ট থাকত	লালুপ্রসাদ সাউ	১৯
বেঙ্গল স্কুলের তিনি এক অপ্রতিম প্রতিশব্দ	যোগেন চৌধুরী	২২
গণেশ পাইনের ছবি : একটি গঠনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা	প্রণবরঞ্জন রায়	২৯
নীল কস্তুরী আভার বর্ণমালা	সৌরেন মিত্র	৪৫
‘তাজমহল দেখে গণেশদার শাজাহান মনে পড়েছে’	অনিতা রায়চৌধুরী	৬৪
গণেশ পাইনের কথা	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬
একান্ত ব্যক্তিগত	অজয় গুপ্ত	৭১
শেষ চিঠি— গণেশদাকে	বীরেন্দ্র চক্রবর্তী	৭৬
আলোকিত অন্ধকারে এক নিরুপম নিঃসঙ্গ চিত্রকর	সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত	৮৭
আড্ডা চূড়ামণি গণেশদা	কমল মুখোপাধ্যায়	৯৭
শিল্পী গণেশ পাইনের সান্নিধ্যের কিছু স্মৃতি	রতন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০
নাটক, ম্যাজিক এবং রঙতুলি	যীশু চৌধুরী	১০৪
কিছু স্মৃতি	চন্দ্রশেখর আচার্য	১১৪
বসন্ত কেবিন ও গণেশ পাইন : এক অনির্বাণ কথামালা	শুভেন রায়	১১৭
গণেশ পাইনের শেষ পর্বের ছবি ১৯৯৯ থেকে ২০১২	মৃণাল ঘোষ	১২৩
শিল্পী গণেশ পাইন ঃ অলংকরণ শিল্পের অন্য ধারা	সমীর ঘোষ	১৩৪

অন্ধকারের উৎস হতে	অনিল গ্রোভার	১৪৮
পড়া ও দেখার চৈতন্যময় জগৎ	আদিত্য বসাক	১৫৬
গণেশ পাইন : উত্তর থেকে দক্ষিণ	প্রদোষ পাল	১৫৮
পরিপার্শ্বের পুরাণ	মধুময় পাল	১৬৮

সাক্ষাৎকার, প্রশ্ন ও উত্তর

গণেশ পাইন	অহিভূষণ মালিক	১৮১
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন লিপিকা গুপ্ত		১৯৩
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রণবকুমার চক্রবর্তী ও কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়		১৯৬
‘অন্যমনে’ পত্রিকার তরফে নেওয়া সাক্ষাৎকার		২০০
‘লৌকিক’ পত্রিকার জিজ্ঞাসার উত্তরে		২০৩
‘সপ্ততুরগ’ পত্রিকার জিজ্ঞাসার উত্তরে		২০৫
শিল্পী হবার শর্ত ‘সাফারিংস’	গৌতম চৌধুরী	২০৭
চিত্রকলায় আধুনিকতার মাত্রা	গণেশ পাইন	২১৩

নিজের লেখা

অভিনব রূপের সন্ধানে	গণেশ পাইন	২২১
শিল্পীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-চিত্রকলা	গণেশ পাইন	২২৪
রামকিংকরের ছবি	গণেশ পাইন	২২৮
একচালা দুর্গা প্রতিমার নব রূপায়ণ প্রতিক্রিয়া	গণেশ পাইন	২৩১

গণেশ পাইনের ছবি

গণেশ পাইনের আঁকা ছবি	২৩৫
অলংকরণ	২৫৩
রঙিন ছবি	৩০৩

বাইরেটা বাংলার মাটির মতো

শ্যামল দত্তরায়

উনিশশো বাষট্টিই হবে। আর্টিস্ট্রি হাউসে একজিবিশন দেখতে গেছি তিন বন্ধু। সনৎ কর, অরুণ বসু এবং আমি। পার্ক স্ট্রিটের এই গ্যালারিটি অনেককাল আগেই ইতিহাস হয়ে গেছে। ছিল, এখন যেখানে পার্ক হোটেল। সেই সময়ের কলকাতার সেরা গ্যালারি। তরুণ প্রবীণ সবারই বছরভর প্রদর্শনী। ভাস্কর চিন্তামণি করের উদ্যোগে কয়েকজন তরুণ শিল্পীর প্রদর্শনী চলছিল। গ্রুপটার নাম অ্যাসোসিয়েশন অফ পেন্টার্স অ্যান্ড স্কাল্পটর্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ছবি দেখতে দেখতে আমরা তিনজনই আকৃষ্ট হয়েছিলাম একটি ছোট ড্রইংয়ে। এক প্রৌঢ়া রমণীর প্রতিকৃতি। ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আলোচনা করি। আমাদের মুগ্ধতা প্রকাশ করি। শিল্পীর নাম গণেশ পাইন। এর আগে আমি গণেশের কয়েকটি কাজ দেখেছি। মনে আছে সিপাহি বিদ্রোহের ওপর একটি কাজের কথা। অরুণ জিজ্ঞেস করে, গণেশকে চেনো? বললাম, নামে চিনি। বলল, দাঁড়াও, পরিচয় করিয়ে দিই। গণেশ এখানে আছেন।

ডেকে নিয়ে আসে। ছোটোখাটো রোগা একটি ছেলে শ্যামলা রঙের। গ্যালারিতে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ কথা হল। প্রস্তাব রাখলাম, আপনি সোসাইটিতে আসবেন? বলা দরকার, আমরা ক'জন তরুণ শিল্পী চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেদের ছবি আঁকার চেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জোট বেঁধেছি। তৈরি করেছি সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস্। ১৯৬০ সালে। গণেশ আগ্রহ দেখান, নেবেন আমাকে? আমার কোনো বন্ধু নেই। সংগঠন নেই। আমি তাহলে বর্তে যাই। ছবি আঁকাটা চালিয়ে যেতে পারব। গণেশ সোসাইটির সদস্য হলেন ১৯৬৩-তে। ওঁর সঙ্গে আমার স্বভাব ও ভাবনার বোধহয় একটা সাযুজ্য আছে, আমি মনে করি। তার জন্য বয়সে বছর পাঁচেকের তফাত সত্ত্বেও শুদ্ধ একান্নবর্তী ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে পেরেছি। অবশ্য গণেশের সঙ্গে সখ্য সবারই। এরকম একটি অনুভূতিশীল মন সবাইকেই আপন করে নেয়। আমি গর্বিত, কয়েকটি ছবিতে উনি লিখেছেন 'আফটার শ্যামল দত্তরায়'।

গণেশ আর আমি একসঙ্গে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছি তিনবার। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-বার, গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে একবার। আমাদের পকেটে তখন হাহাকারময় অসীম শূন্যতা। চাকরি হয়নি দুজনের। ইন্টারভিউয়ের লোকদেখানো ব্যবস্থা

নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। একবার গণেশ, সনৎ, রবীন মণ্ডল এবং আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপক পদের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছি। ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন ধীরেন মিত্র, রমা চৌধুরী এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে পূর্ণ চক্রবর্তী। নীচে দেখি পোস্টার 'ইন্টারভিউয়ের নামে প্রহসন কেন'? একজনকে নাকি কর্তৃপক্ষ আগেই ঠিক করে রেখেছেন? ইন্টারভিউ নিয়ে দেখানো হবে আমরা অযোগ্য। এই নিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলছে। নাম-কা-ওয়াস্তে আমাদের বোর্ডের সামনে হাজির করানো হল। আমি তো পূর্ণবাবুকে বলেই ফেললাম, কী দরকার খামোখা জিজ্ঞাসা করে। আমাদের চাকরি হয়নি স্বাভাবিকভাবেই। মনে আছে, একসঙ্গে ইন্টারভিউ দিতে আসার ব্যাপারটা উদ্‌যাপন করার জন্য আমরা চিৎপুরের রয়্যালে চাপ খেয়েছিলাম। গণেশ চাকরি খুঁজেছেন, আমি খুঁজেছি। আর দুজনে বলেছি, চাকরি হয়তো হবে না। কিন্তু আমাদের তুলি কেউ বন্ধ করতে পারবে না। গণেশ পরে রবীন্দ্রভারতী কর্তৃপক্ষের দেওয়া লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফিরিয়ে দিয়েছেন বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণ বেশ কয়েকবার। হ্যাঁ, গণেশ এরকম। বাইরেটা বাংলার মাটির মতো নরম সজল। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে দুর্ভেদ্য হয়ে যান। ছবি আঁকার মতো সব ব্যাপারেই উনি সিরিয়াস। কোনো আলগা ব্যাপার নেই। তার মানে কিন্তু এই নয় যে উনি খুব রাশভারী গম্ভীর। বরং উলটোটাই। ওঁর রসিকতায় বুদ্ধির ঝলক আমাদের চোখে-মুখে আলো ফেলে। গণেশ খুব বড়ো আড্ডাবাজ। কারণ উনি শোনেন বেশি, বলেন কম। আমি আবার বলি বেশি, শুনি কম। গণেশ বড়ো আড্ডাবাজ না হলে সে আড্ডায় আমার ঠাঁই হত না।

আমাদের ছবি আঁকার একটাই অর্থ, বেঁচে থাকা। স্বপ্নেও ভাবিনি আমাদের ছবি পয়সা দিয়ে কেউ কোনোদিন কিনবে। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে। আমাদের দারিদ্র্য ঘুচবে। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট থেকে একটি টিম এসেছে বাংলার কিছু কাজ কিনবে বলে। শিল্পীবন্ধু অনিলবরণ সাহার বাড়ি থেকে সদর স্ট্রিটে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পেছনে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে ছবি নিয়ে গেছি ভোরবেলা। দুদিন অপেক্ষা করার পর মাত্র একটি ছবি ওঁরা পছন্দ করেন। ২০০ টাকা দিয়ে কেনেন। ছবিটা গণেশের আঁকা। সোসাইটির আমরা সবাই বেজায় খুশি। বিজয়োৎসব করেছি সেদিন। এইরকমই ছিলাম আমরা। পরীক্ষক হয়ে শান্তিনিকেতন গেছি দুজনে। কালভার্টে মাঝরাত পর্যন্ত তর্ক করেছি। আধুনিক শিল্পের সংজ্ঞা, সংকট এইসব নিয়ে। এভাবেই আমরা চলেছি শুধু ছবির কথা ভেবে। শুধু ছবি আঁকার জন্যই আমরা প্রতিদিন পরস্পরের নিকটতর হয়েছি। বিরোধ যে হয়নি তা নয়। গণেশ বলতেন, শ্যামলদা, আপনি সোসাইটির ফেভিকল।

তাঁর ছবিতে লিটারারি কনটেন্ট থাকত

লালুপ্রসাদ সাউ

আমি আর গণেশ পাইন একসঙ্গে পড়তাম। একই সালে, ১৯৩৭-এ আমরা জন্মাই। উনি ১৯৫৫ সালে আর্ট কলেজে ঢোকেন আর আমি ১৯৫৪ সালে। গণেশ পাইন ১৯৫৫ সালে ইন্টারভিউ দেন, তাঁর ছবি দেখে সিলেকশন কমিটি এত মুগ্ধ হয় যে তাঁকে একেবারে সেকেন্ড ইয়ারে আমার সঙ্গে ভরতি নিয়ে নেয়। উনি প্রথম থেকেই বেঙ্গল স্কুলের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের খুব ভক্ত ছিলেন ও ওই ধরনের ওয়াশ ও টেম্পেরা নিয়ে অনেকগুলো কাজ করেছিলেন। পর পর করেই যাচ্ছিলেন। যখন প্রথম ক্লাসে এলেন একটা ধুতি পাঞ্জাবি পরে একটা বেঁটে ছোটোখাটো লোক, আমরা বলাবলি করেছিলাম, কী করে উনি সেকেন্ড ইয়ারে চলে এলেন। আমাদের মাস্টারমশাই গোপাল ঘোষের কাছে গিয়ে ছবি নিয়ে যেতে মাস্টারমশাই খুব প্রশংসা করে আরও কাজ করতে বললেন। গণেশ আমাদের পাশাপাশিই বসলেন ক্লাসে। গোপালবাবুর ক্লাসটা ছিল নেচার স্টাডির ক্লাস। তারপর উনি রেগুলার বেঙ্গল স্কুলের কাজ করে গিয়েছেন। লাইট ও শেড দিয়ে ওয়াটার কালারের কাজও করে গিয়েছেন। তাঁর একটা খুব ভালো গুণ ছিল, উনি খুব ভালো মেমোরি ড্রইং করতেন। এই জিনিসটা অনেকের মধ্যেই ছিল না। আমরাও পারতাম না তাঁর মতো এত সুন্দর মেমোরি শার্প ড্রইং করতে। থার্ড ইয়ারে আমরা নিয়েছিলাম ওয়েস্টার্ন স্টাইল অব পেন্টিং। আর্ট কলেজে দুটো ডিপার্টমেন্ট আছে, একটা ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেন্টিং আর অন্যটা ওয়েস্টার্ন স্টাইল অব পেন্টিং। সেখানে বিদেশি অ্যান্টিক মূর্তি ড্রইং করতে হত, গণেশ খুব সুন্দর ড্রইং করতেন। পেনসিলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ড্রইং করে খুব সুন্দর কালার চাপাতেন। যখন অয়েল পেন্টিং শুরু হল, উনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। অয়েল মিডিয়ামটাকে তিনি মানসিকভাবে নিতে পারেননি এবং পছন্দও করতেন না। ফলে ক্লাসে ড্রইং করার পর উনি একটা লেয়ার অয়েল পেন্ট চাপিয়ে দিয়ে নীচে চলে যেতেন, আর আসতেন না। পরের দিন মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করাতে বলতেন, ভালো লাগছে না, করতে পারছি না, আমাকে এটা টেম্পেরায় করতে দিন, আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। মাস্টারমশাই বলতেন, সবাই এক মিডিয়ামে করছে আর তুমি অন্য মিডিয়ামে, এটা তো হতে পারে না। তুমি কমপোজিশন ক্লাসে